দেশ বিভাগ দেশের অর্থনীতি
ও
সংস্কৃতি বাঁচাতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে
সংগ্রামে নামুন
প্রসঙ্গ ঃ অনুপ্রবেশ
অমলেশ মিশ্র

Prasanga : Anuprabesh
by Amalesh Mishra

গ্রন্থস্বত্ব : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রকাশক : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সংস্করণ : ২৫শে অক্টোবর, ২০১৪
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

লেখক : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

অক্ষর বিন্যাস : তপন কুমার সাউ
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৮২৪০৫৯

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক, কাঁথি

মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র

অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র জাতীয় নয়, জাতীয়তার সমস্যা অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশের থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যে গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি এতদিন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ব্যতীত আর কেউই কোন গুরুত্ব দেয়নি। অনুপ্রবেশ নিয়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঃ বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেমন মহারাষ্ট্র, দিল্লী, গুজরাট, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ এই সমস্যায় ভুগছে যদিও তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম। বিজেপি অনুপ্রবেশকারী বলতে শুধুমাত্র মুসলমানদের বোঝায়, ওদেশ থেকে পালিয়ে আশা হিন্দুরা বিজেপি সজ্ঞায় অনুপ্রবেশকারী নয় তার শরণার্থী। এই অনুপ্রবেশকারী ও শরনার্থী দুইটি শব্দ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে সমার্থক। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা কেবলমাত্র মুসলমানদেরই অনুপ্রবেশকারী বলায় তারা বিজেপির মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পান। দেশ বিভাগর সময় পূর্ব-পাকিস্তান বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে হিন্দুরা এদেশে চলে এসেছিলেন তাদের কিন্তু শরণার্থী বলা হয়েছিল। কিন্তু ওদেশ থেকে সেই বিভাজনের সময়কার কারণে যদি কোনো হিন্দু এদেশে চলে আসেন, বলা ভাল পালিয়ে আসেন, তাদের কিন্তু অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখন আর শরণার্থী বলতে রানি নন। তাদের তারা অনুপ্রবেশকারীই বলছেন। প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রসংঘের কমিশন অন রিফিউজিস এর সংজ্ঞায় আসতে হয়। রাষ্ট্রসংঘের বিচারে একজন ব্যক্তিকে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু গণ্য করা যায় যদি সে তার নিজের দেশের (এক্ষেত্রে বাংলাদেশ) আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে অন্যদেশে (এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ) আশ্রয় চায় জীবন, সম্পত্তি, সম্মান, খোয়া যাওয়ার ভয়ে বা আশংকায় এবং এ ভয় বা আশংকার কারণ হবে তার ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্ম, জাতি (faith creed, religion, race)। বাংলাদেশ থেকে মুসলমানদের ভারতবর্ষে পালিয়ে আসার পিছনে রাষ্ট্রসংঘ উল্লিখিত কারণগুলি প্রযোজ্য নয়। কারণ বাংলাদেশ ঐশলামিক দেশ হওয়ায় ওখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্ম বা জাতির কারণে জীবন, সম্পত্তি সম্মান খোয়া যাওয়ার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ওদেশের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। তাই ওদেশের থেকে মুসলমানরা এদেশে পালিয়ে এলে তাদের অনুপ্রবেশকারী এবং হিন্দুরা পালিয়ে এলে তাদের শরণার্থী বা উদ্বাস্তু বলতে হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল হয় UN Commission of Refugees '52 এই খবর রাখেন না, না হয় মুসলিমদের কাছে অপ্রিয় হওয়ার আশংকায় অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীর পার্থক্যটা বিবেচনায় আনেন না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর কী ধরনের অত্যাচার ও বর্বরতা হয় তার কোনো সরকারি তথ্য পাওয়ার উপায় নাই। বেসরকারীভাবে এই অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে বিতর্কিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এর লজ্জা নামক বইটিতে (পেঙ্গুইন ১৯৯৪) এ ছাড়া দ্বিতীয় বেসরকারি সূত্র

হল বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইউনিটি কাউন্সিলের একটি রিপোর্ট যা ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। [Communal discrimination in Bangladesh, facts and documents published by the Bangla Desh Hindu - Budhist Christian Unity Council.]

এছাড়া বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা (১৯৭৯-এর পর) হিন্দুদের সংখ্যার দিকে তাকালেও এ বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে আমরা পরে আসব।

অনুপ্রবেশ-এর প্রশ্নটি একটু গভীরভাবে দেখা আবশ্যক এই কারণে যে এর সঙ্গে একটি দেশের জনতাত্ত্বিক পরিস্থিতি ও পরিবর্তন (Demographic Change) শুধু যুক্ত নয় এর সঙ্গে একটি দেশের কর্মসংস্থান তথা অর্থনীতি, জাতীয়তা, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিক প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ঐতিহাসিক বিষয়ে এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতেই হবে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সব দেশেই প্রথমে সংখ্যালঘু হয়েই প্রবেশ করেছিল এবং পরে সেই সব দেশে তারা সংখ্যাগুরু হয়ে সেগুলিকে ঐশ্লামিক দেশে পরিণত করেছে। ইসলামি ক্যালেন্ডারই তার সাক্ষ্য বহন করে। মহম্মদ ও তার অনুগামীরা মক্কা থেকে মদিনায় আসার সময় থেকেই হিজরী সাল গণনা হয়ে থাকে। মদিনা কালক্রমে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সমস্ত ঐশ্লামিক দেশ সম্পর্কেই চোখ বন্ধ করে একথা বলা যায়। এই ভাবেই একটি দেশের জাতীয়তা পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষ যে কেন এখন ঐশ্লামিক দেশ হয়নি, অথচ অন্যান্য দেশ হয়ে গেছে তার কারণ স্বতন্ত্র। তা পরে আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরোপের বিষয়ে বলতে গিয়ে Bat Ye'or বলেছেন, the Islamic Movement does not conceal its intention to islamise Europe at all. Brochires sold in Europe Islamic centres explain goal and means, including conversion work, marriages with native women and specially immigration, Knowing that Islam always started as a minority in the countries it conquered, These idiologies consider the implantation of Islam in Europe and the U.S.A. as a great chance for Islam. [The Demographic seige by Keonrad Elst. voice of India Page-18]

বাংলাদেশ থেকে ভীষণ সংখ্যায় পঃ বাংলায় তথা ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ হচ্ছে মূলত তিনটি কারণে —

১। বাংলাদেশে ব্যাপক দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের অভাবে।

২। বাংলাদেশ এদেশে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিজের দেশে জনসংখ্যার চাপ কমাতে চায়।

৩। পঃ বাংলায় এবং ভারতবর্ষে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক লাভ এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এলাকা বৃদ্ধি ঘটানো। যারা এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাঁরা সকলেই এই তৃতীয় কারণটি সম্পর্কে সর্বদা যে ওয়াকিবহাল আছে তা নয়। ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ বেশি হয় তার কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এই অনুপ্রবেশ নিয়ে যতটা কড়া ভারতে তার কিছুই নাই। বরং উলটো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হিসাবে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত অনুপ্রবেশ ব্যাপারটিকে আমলই দেন নি। আবার পঃ বঙ্গ সি পি এম ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই এই ৫০ বছরে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে প্রথম গুরুত্ব দিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনুপ্রবেশ সমস্যায় অস্থির হয়ে জেলা শাসকের বৈঠক করে নানা ধরনের ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন।

জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন Demographic change যে কী ভীষণ সে সম্পর্কে সমস্ত দেশই অবহিত। আমাদের দেশের যারা সরকারি ভোট রাজনীতিতে যুক্ত নন তারাও ব্যাপারটা বোঝেন। বিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা আমাদের দেশেরই রফিক জাকেরিয়া তার দি ওয়াইডনিং ডিভাইড (ভাইকিং প্রকাশনা-পেঙ্গুইন প্রকাশনা, ১৮১ পৃঃ) বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ৩৬৫ বছর পর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। ভারতবর্ষে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখেই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করছেন। অপরদিকে নমিতা ভান্ডারী ও এম. জৈন হিসাব করে দেখেছেন যে ৩১৬ বছর পরে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকে অতিক্রম করবে। (এ প্যামপারড্ মাইনরিটি সানডে পত্রিকায় ৭-২-৯৩) [The widening Devide - Rafik Zakeria. Penguine/Viking. P-181 A Pampered Minority - Sunday 7.2.93]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্মহার বরাবরই হিন্দুদের থেকে বেশি। এমন কী পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশের ও মুসলিমদের জন্মহার থেকে ভারতে মুসলমানদের জন্মহার বেশী। জন্মহার কেন বেশি তার কোনো প্রত্যক্ষ কারণ নেই। গোপন কোনো উদ্দেশ্যের খবরই পাওয়া যায় নি তবু ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এর কোনো গোপন উদ্দেশ্য থাকতে পারে যা নাকি সাধারণ মুসলমানদের অজ্ঞাত। আর হিন্দুদের কথা না বলাই ভালো কারণ তারা দেখেও দেখেন না। সাধারণ হিন্দুরা ক্যালাস বা উদাসীন - যা হচ্ছে হোক। এই বিষয় নিয়ে কথা বলাকে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে, আর হিন্দুদের মধ্যে যারা এই প্রশ্ন তোলে তাদের সাম্প্রদায়িক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শাসক সম্প্রদায় এ সব বিষয় যতটা কঠোর এ দেশের শাসক সম্প্রদায় ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এ বিষয় বারো হাত কাপড়ে ল্যাংটা হয়ে আছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কী রকম সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। ২০০১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট বেরোনোর পর অনেক হৈ চৈ হল। প্রথম রিপোর্টে পাওয়া গেল যে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০.৩% আর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৬%। রাতারাতি হিসাব পাল্টে গেল। বলা হল যে, ১৯৮১তে আসামে জনগণনা হয়নি আবার ১৯৯১তে জম্মু কাশ্মীরে হয়নি। তাই এ্যাডজাস্ট করতে হবে। এ্যাডজাস্ট করার পর দেখা গেল হিন্দু জনসখ্যা বৃদ্ধির হার যা ছিল প্রায় তাই আছে ২০% আর মুসলিম জনসখ্যার বৃদ্ধির হার অনেকমা কমে হয়েছে ২৯.৩%। ভাবটা যেন এই যে ৩৬ নয় ২৯ অতএব ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সংখ্যাটা ৩৬ বা ২৯ যাই ই হোক তা ২০-র থেকে বেশী।

দি ইকোনমিস্ট পত্রিকায় ২৬-২-৯৪ তারিখে রিপোর্ট বেরিয়ে ছিল যে মালয়েশিয়ার খ্রিস্টান পরিচালিত রাজনৈতিক দল শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে 'শাসক দল ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনস থেকে মুসলিম আনিয়ে নির্বাচনে অধিক আসনে জিতেছেন। সারা প্রদেশে মুসলিম প্রধান নির্বাচনী ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে ছিল ১৭টি কিন্তু ১৯৯৪ সালে মুসলিম প্রধান নির্বাচনী ক্ষেত্র হয়ে গেল ২৪টি। আমাদের রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটেছে। যথাস্থানে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে তা উল্লেখ করব। মুসলিমদের মধ্যে বর্দ্ধিত জন্মহার এবং অনুপ্রবেশকারী এ দুই দুর্ঘটনায় এদেশেও মুসলিম প্রধান নির্বাচনী ক্ষেত্র বেড়েছে। আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ বেশি হয় কী কারণে তা উল্লেখ করেছি। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসকেরা ভোট ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং প্রগতিশীলতার আড়ালে এই বিষয়টি এড়িয়ে যান। অথচ মালয়েশিয়া সরকার ১৯৯৭-এর শেষে যখন দেখলেন যে প্রায় এক লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাদের দেশে বে-আইনী ভাবে ঢুকে পড়েছে তখন ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারীতে তাদের এক এক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সৌদি আরব এবং ইউনাইটেড আরব এমিরিটাস এবং কাতারের পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশি অনুপ্রবেহকারীকে তাড়ানো হয়েছে। বছর কয়েক আগে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে ৫০ হাজার শ্রমিক নেওয়ার চুক্তি করেছিল। কিন্তু সরকার যখন দেখল গোপনে বে-আইনিভাবে আরও বাংলাদেশি তাদের দেশে অনুপ্রবেশ করেছে এবং কাজ করছে, তখন মালয়েশিয়া সরকার একতরফা ভাবে সেই চুক্তি বাতিল করে দিল। এই সব দেশের কোনো রাজনৈতিক দলই ওই দেশের কোনো উলুবেড়িয়া ট্রেন থেকে ওই অনুপ্রবেশকারীদের মালয়েশিয়ার লোক বলে নামিয়ে নেয়নি। বা ওই দেশের খ্রিস্টান পরিচালিত বিরোধী দল যখন অভিযোগ করল তখন তাদের সাম্প্রদায়িক বলে কেউ গালমন্দ করেনি। সৌদি আরব, ইউনাইটেড আরব এমিরিটাস এবং কাতার ঐশ্লামিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দিতে আপত্তি করেনি। বিগত ১০০ বছরের রিপোর্ট নিয়ে দেখা যাবে এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা সবসময় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবর্ষ ৩১৬ বছর পরে মুসলিম প্রধান দেশ হবে অথবা ৩৬৫ বছর পরে হবে সে চিন্তা বাদ দিলেও অনুপ্রবেশের ফলে যে অর্থনীতি ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেদিকে উদাসীন থাকা যায় না। অনুপ্রবেশের এই ভয়ংকরতা যখন কিছু সংবাদ মাধ্যম, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু বুদ্ধিজীবি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান বা লঘু করে দেখেন তখন দেশের বিপদ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ইসলাম সংস্কৃতি গ্রাস করেছে। পৃথিবীর সব দেশেই তার নিজস্ব সংস্কৃতি একদা সংখ্যালঘু হয়ে অনুপ্রবেশ করা ভিন্নধর্মীদের কাছে খুইয়ে দিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ ও চীন। এবং এই সংস্কৃতি বিলুপ্তির ঘটনায় ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশ সব থেকে বেশি ও বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করার আগে বিগত ১০০ বছরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিকে একবার নজর

দেওয়া যাক এ বিষয়ে আমরা আদমসুমারীর রিপোর্টের উপর ভরসা করব। ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ছিল ইংরাজ শাসনের কাল।

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
হিন্দু	৭৫.০১	৭৪.২৪	৭২.৮৭	৭১.৬৮	৭০.৭৩	৭০.৬৭	৬৯.৪৬
মুসলমান	১৯.৯৭	২০.৪১	২১.৮৮	২২.৩৯	২৩.২৩	২৩.৩৯	২৪.২৮

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন হয়। অনেক মুসলিম ওদিকে গেল। অনেক হিন্দু এদিকে এল। মুসলমান প্রধান এলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দু প্রধান এলাকা নিয়ে হিন্দুস্থান গঠিত হল আদমসুমারীর রিপোর্ট ঃ-

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৮৪.৯৮	৮৩.৫১	৮২.৭২	৮২.২৯	৮১.৮০	৮০.৫
মুসলমান	৯.৯১	১০.৭০	১১.২১	১১.৭৩	১২.৭৩	১৩.৪

এই হিসাব ১৯৮১ এবং ১৯৯১-র জনগণনা বা আদমসুমারীর হিসাব অসম্পূর্ণ কারণ ১৯৮১ সালে আসামে জনগণনা হয়নি আর ১৯৯১ তে জম্মু কাশ্মীরে জনগণনা হয়নি। যদি ঐ দুই দেশের হিসাব আগের আগের বছরের জনগণনার নিরিখে নেওয়া হয় তবে ছবিটা হবে ১৯৯১ সালে হিন্দু ৮১.৫৪ এবং মুসলমান ১২.৬০ (আশিষ বোস-এর 1991 Census Data : Mulsim rate of growth শিরোনামে ৯.৯.৯৫তে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধ) ১৯৯১ সালে জনগণনার প্রাপ্ত হিসাব বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের সম্ভবতঃ হিসাবের মধ্যে আনা যায়নি কারণ তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই জনগণনা এড়িয়ে গেছে। আশিষ বোস তার এই প্রবন্ধে বলেছেন এবং আমরাও হিসাব পাচ্ছি যে প্রতি দশবছরে মুসলিম জনসংখ্যা ভারতবর্ষে ১ শতাংশ করে বাড়ছে অনুপ্রবেশকারীদের হিসাব বাদ দিয়ে বা আংশিকভাবে নিয়ে / অপরদিকে হিন্দু জনসংখ্যা কাছাকাছি ১ শতাংশ কমছে। বিখ্যাত লেখক রফিক জ্যাকেরিয়া বোধহয় এই হিসাবের ভিত্তিতে তার বিখ্যাত পুস্তক দি ওয়াইডেনিং ডিভাইড বইতে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু হতে অন্তত ৩৬৫ বছর লাগবে। প্রতি ১০ বছর যদি ১ শতাংশ বাড়ে তবে ৩৬৫ বছরে বাড়বে ৩৬.৫ শতাংশ। ১৯৯১ সালে আছে ১২.৬০ তার সঙ্গে ৩৬.৫ যোগ করলে হয় ৪৯.১০ শতাংশ। এর সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী ও তাদের বংশ বৃদ্ধি ধরলে কত হবে হিসাব করতে হবে। প্রসঙ্গত বলি ৫০ শতাংশ জনসংখ্যা হলেই একটি মুসলমান দেশ নিজেকে ঐশ্লামিক দেশ বলে ঘোষণা করে থাকে। যাই হোক, ৭-২-৯৩ তারিখে সানডে পত্রিকায় প্রকাশিত দি প্যার্মপারড মাইনরিটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল ভারতবর্ষ ৩১৬ বছর পরে মুসলিমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যাবে। আর রফিক জ্যাকেরিয়া বলেছেন ৩৬৫ বছর পরে।

পঃ বঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি দরিদ্র ও জনসংখ্যার দিক থেকে অতি ভারাক্রান্ত

রাজ্য। পঃ বঙ্গ ভারতবর্ষের মোট আয়তনের মাত্র ৩ শতাংশ অথচ ভারতের মোট জনসখ্যার ৮.০৬ শতাংশ এই রাজ্যে বাস করে। এই রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব সব থেকে বেশি প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৭৬৬ জন। অথছ এই রাজ্যে মোট জনসখ্যার হিসাবে দেশে ৪র্থ স্থানে। প্রথম উত্তরপ্রদেশ জনসংখ্যা, দ্বিতীয় বিহার, তৃতীয় মহারাষ্ট্র, চতুর্থ পঃ বঙ্গ। এই হিসাবটা ১৯৯১-র আদমসুমারির ভিত্তিতে এবং একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে এই গণনার ১৯৯১ পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীর হিসাব ছিল না এবং বিগত ১৪ বছরে যে ব্যাপক এবং বিশাল অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার নিরিখে ১৯৯৯ সালে পঃ বঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব আরও বেড়েছে। পঃ বঙ্গে শতকরা ৭০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে যদিও সারা ভারতবর্ষে গড় হল শতকরা ৪০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। [State Politics in India - Iqbal Narain. Minakshi Prakasan, New Delhi, P-374]

এটা হল ১৯৭৬ সালের হিসাব। এই চল্লিশ বছরে এই পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হতে পারে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এ রাজ্যে ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ বাস করেন। এদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীর হিসাব নাই কারণ ঐ জনগণনায় নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার হিসাব নেওয়া হয়নি। No many people know that in 1991 Census there were no questions of citizenship and Nationality. [Population of India - Ashis Bose, P-30]

এই কারণেই অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত নিশ্চিত তথ্য এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ও বেসরকারি হিসাব-এর উপর নির্ভর করতে হবে এবং অবশ্য সরকারি তথ্য যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং শাসকদলের ইচ্ছানুযায়ী তা বানানো হয় এ বিষয়ে আশিস বোস-এর ওই বইতে ২৯ পৃঃ উল্লিখিত হয়েছে।

পঃ বঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমা এই রাজ্যের ৯টি জেলা স্পর্শ করে মোট ২২০৩.৪৬ কি.মি. বিস্তৃত। জেলাওয়ারি হিসাবটা এই রকম ঃ-

১।	দঃ ২৪ পরগণা	৬৩.০০ কিমি.
২।	উঃ ২৪ পরগণা	২৮০.৭২ কিমি.
৩।	নদীয়া	২৬৩.৭৮ কিমি.
৪।	মুর্শিদাবাদ	১২৫.৩৯ কিমি.
৫।	মালদহ	১৭৩.৩৪ কিমি.
৬।	উঃ দিনাজপুর	৫৫৮.৫২ কিমি.
৭।	দার্জিলিং	২৩.৮৭ কিমি.
৮।	জলপাইগুড়ি	১৫৩.৪২ কিমি.
৯।	কোচবিহার	৫৬১.৪২ কিমি.
	মোট	২২০৩.৪৬ কিমি.

এই ২২০৩.৪৬ কিমি.-এর মধ্যে দঃ ২৪ পরগণা সীমান্তে (৬৩ কিমি.) এবং অন্যান্য জেলার সীমান্তের (১৮৫.৫০) কিমি: মোট ২৪৮.৫০ কিমি. নদী বিধৌত। বর্ষার আগে বা পরে এই বিস্তৃত এলাকা দিয়ে সীমান্ত সহজেই পেরিয়ে যাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার আগে পূর্ব পাকিস্তান নাম থাকাকালীন ধর্মীয় অত্যাচারে অগণিত হিন্দু পঃ বঙ্গে চলে এসেছেন। ১৯৭১ সালের পরেও হিন্দুরা এসেছেন উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হয়ে মুসলমানরা এসেছেন অনুপ্রবেশকারী হিসাবে। কয়েকবছর আগে অনুমানিক দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হিন্দু এদেশে চলে এসেছিল বাংলাদেশ ছেড়ে চিরকালের মত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুজিবর রহমান ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ থেকে পরবর্তীকালে ঐশ্লামিক দেশ হিসাবে ঘোষিত হওয়া এবং ধর্ম বিদ্বেষ-এর কারণে হিন্দুরা এলেও মুসলমানারা এসেছেন প্রধানত রুটি রুজির কারণে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আর্থিক অবস্থা সে দেশের মুসলমানদের এদেশে আসতে বাধ্য করেছে। হিন্দু প্রধান পঃ বঙ্গে মুসলমান প্রধান করে দেওয়ার প্রত্যক্ষ কোনো উদ্দেশ্য এই অনুপ্রবেশকারীদের মাথায় ছিল না। পরবর্তীকালে কোনোও ধর্মীয় উন্মাদনা তাদের মাথায় হয়ত একথা ঢুকিয়ে থাকতে পারে। তবে আমরা বিচলিত বাড়তি জনসংখ্যা, বসতির অসংকুলান ও এদেশের মানুষের খাদ্য রেশনে ভাগ বসাচ্ছে, অসংগঠিত শ্রমিকেরা কাজে ভাগ বসাচ্ছে, সমাজবিরোধী কাজকর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে, চোরাচালন ব্যাপক হয়ে গেছে, এমনকী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেও অনুপ্রবেশকারীরা অংশ নিচ্ছে। পঃ বঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের জাতীয় গড়ের থেকেও বেশি হয়ে যাচ্ছে, অনুপ্রবেশের কারণে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হিন্দুরা এ রাজ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রেণে আগ্রহী নয়। বরং উদাহরণ আছে যে দরিদ্র মুসলমান জনগণকে জন্ম নিয়ন্ত্রেএর নিরুৎসাহ করা হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে। যদিও সে দোহাই ঠিক নয়। কিন্তু অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলমান এ দোহাইকে বিশ্বাস করেন।

মহম্মদ সফীউল্লা তার পুস্তক মুসলিমস্ ইন এ্যালিয়েন সোসাইটি পুস্তকে (পৃঃ ৮৬-৯৭) [Muslim in Alien Society. Delhi 1992 Ch-8. Islam and birth Control] বলতে চেয়েছেন যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলাম-ধর্ম সম্মত নয়। তিনি তার ঐ পুস্তকে অনেক হাদিশও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৮৭) মহম্মদ ইমরান তার পুস্তকে আইডিয়েল ওয়ম্যান ইন ইসলাম পুস্তকে (পৃঃ ৬৬) সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে বলেছেন। [Ideal Woman in Islam, Delhi, 1994]

এছাড়া অনেক মুসলিম সংগঠনও এই জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। তার ফলে জনসংখ্যা মুসলিম সম্প্রদায়েই বেশি বেড়েছে। আমরা পঃ বঙ্গের যে ৯টি জেলা নিয়ে কথা বলছিলাম সেগুলির অবস্থা লক্ষ্য করুন। ভারতের জনবৃদ্ধির গড় হার ২৩.৫০ শতাংশ। কিন্তু পঃ বঙ্গে ২৪.৫৫ শতাংশ। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ এই দশ বছরে আমাদের উল্লিখিথ ৯টি জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে —

১।	দঃ ২৪ পরগণা	৩০.০৮ শতাংশ
২।	উঃ ২৪ পরগণা	৩১.৬৬ শতাংশ
৩।	নদীয়া	২৯.৮২ শতাংশ
৪।	মুর্শিদাবাদ	২৮.০১ শতাংশ
৫।	মালদহ	২৯.৬৩ শতাংশ
৬।	উঃ দিনাজপুর	৩০.২৫ শতাংশ
৭।	দার্জিলিং	৩০.৪০ শতাংশ
৮।	জলপাইগুড়ি	২৫.৯৬ শতাংশ
৯।	কোচবিহার	২১.৮২ শতাংশ

[Demographic Diversity in India, 1991 Census, Ashis Bose P-386]

দেখা যাচ্ছে কোচবিহার ব্যতীত সব কয়টি জেলাতেই এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শুধু ভারতবর্ষের গড় থেকে নয় পঃ বঙ্গের গড় (২৪.৫৫ শতকরা) এর থেকেও বেশি। এই রাজ্যের অন্যান্য জেলার জন্ম বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম, না হলে পঃ বঙ্গের গড় ২৫.৫ শতকরা হওয়া সম্ভব ছিল না। এই জেলাগুলির মধ্যে আবার মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তরদিনাজপুর মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যার হার বেশি। মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা ৬৩.৬৭ শতাংশ। মালদহ মুসলিম জনসংখ্যা ৪৯.৭২ শতাংশ, উঃ দিনাজপুর মুসলিম জনসংখ্যা ৪৭.৩২ শতাংশ।

[Demographic Diversity in India P-39]

আবার নদীয়া, উঃ ২৪ পরগণা ও দঃ ২৪ পরগণায় মুসলিম ভোটার এত বেশি যে রাজ্য বিধানসভার ৬৪টি আসনে তারাই হারজিতের নিয়ামক ও ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর।

ঐ তিনটি জেলায় মোট বিধানসভা আসন যথাক্রমে ১৫ + ২৮ + ২৫ = ৬৮ রাজ্য বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ২৯৪।

বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীদের চিহ্নিত করার কাজে পঃ বঙ্গের পুলিশের দেওয়া হিসাব এই রকম।

বছর	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৯৭২-৯১	৬৩,৭৬২	১,২৪,৪০৮	৬৬৬

অর্থাৎ প্রতি একজন হিন্দু শরণার্থীর অনুপাতে দুইজন মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। পঃ বঙ্গে পুলিশের কাছে পাওয়া এ তথ্যের সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর দেওয়া হিসাবটা দেখুন ঃ

বছর	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
১৯৭৭-৯	৬৪,১২৫	১,৫১,১৭৫	২৮৬৫

অর্থাৎ প্রতি একজন হিন্দুর অনুপাতে ২.৫ জন মুসলিম অনুপ্রবেশ করছে।

১৯৭২-৯১ সালের মধ্যে ৫,৮৮,৪৯১ জন বাংলাদেশি নাগরিক (হিন্দু ও মুসলমান) ভারতবর্ষে বৈধভাবে পাশপোর্ট নিয়েই এসেছিলেন। তারা কেউ আর ফিরে যান নি।

রাজ্য পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী যে হিসাবটা দিয়েছে তা মোট অনুপ্রবেশের একটি অংশ মাত্র। এর কয়জন কে তারা ধরেছে বা সনাক্ত করেছে ? ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত হিসাবটা ভালো করে দেখতে বলছি এই কারণে যে এই সময় সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য চালাচ্ছে এবং এই সময় জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো মহামহোপাধ্যায়রা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই বুদ্ধদেববাবু সম্পর্কে আরোও ভাল খবর পরে দিচ্ছি।

২০০১ সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে জানা যায়

		মোট জনসংখ্যা কত ?
পঃ বঙ্গে মোট জনসংখ্যা —	৮০১৭৬১৯৭	
হিন্দু —	৫৮১০৪৮৩৫	৭২.৮৭
মুসলমান —	২০২৪০৫৪৩	২৫.২৫

		মোট সংখ্যা	কত শতাংশ	সংখ্যা বৃদ্ধির হার
১.	দার্জিলিং	১৬০৯১৭২	—	—
	হিন্দু	১২৩৭৭১৪	৭৬.৯২	২২.১৫
	মুসলমান	৮৫৩৭৮	৫.৩১	৪৪.৩৭
২.	জলপাইগুড়ি	৩৪০১১৭৩	—	—
	হিন্দু	২৮৩৩২২৯	৮৩.৩০	১৯.২৯
	মুসলমান	৩৬৯১৯৫	১০.৮৫	৩১.৩৬
৩.	কোচবিহার	২৪৭৯১৫৫	—	—
	হিন্দু	১৮৭১৮৫৭	৭৫.৫০	১২.৭৮
	মুসলমান	৬০০৯১১	২৪.২৪	১৮.৫৯
৪.	উত্তর দিনাজপুর	২৪৪১৭৯৪	—	—
	হিন্দু	১২৬৩০০১	৫১.৭২	৩৫.৪০
	মুসলমান	১১৫৬৫০৩	৪৭.৩২	০.৬০
৫.	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৫০৩১৭৮		জেলা ভাগ হওয়ায়
	হিন্দু	১১১২৫৭৫	৭৪.০১	বৃদ্ধির হার
	মুসলমান	৩৬১০৪৭	২৪.০২	পরিষ্কার নয়
৬.	মালদহ	৩২৯০৪৬৮	—	—
	হিন্দু	১৬২১৪৬৮	৪৯.২৮	১৭.৬৮
	মুসলমান	১৬৩৬১৭১	৪৯.৭২	৩০.৬৫

৭.	মুর্শিদাবাদ	৫৮৬৬৫৬৯	—	—
	হিন্দু	২১০৭৪৬৯	৩৫.৯২	১৫.৮৮
	মুসলমান	৩৭৩৫৬৮০	৬৩.৬৭	২৮.৩৬
৮.	বীরভূম	৩০১৫৪২২	—	—
	হিন্দু	১৯৪৪৬০৬	৬৪.৪৯	১৪.২৪
	মুসলমান	১০৫৭৮৬১	৩৫.০৮	২৫.১৯
৯.	বর্ধমান	৬৮৯৫৫১৪	—	—
	হিন্দু	৫৪৪০০৫২	৭৮.৮৯	১২.৮৩
	মুসলমান	১৩৬৪১৩৩	১৯.৭৮	১৫.৩৪
১০.	নদীয়া	৪৬০৪৮২৭	—	—
	হিন্দু	৩৩৯৬০৯৫	৭৩.৭৫	১৮.৫৮
	মুসলমান	১১৭০২৮২	২৫.৪১	২১.৯০
১১.	উত্তর ২৪ পরগণা	৮৯৩৪২৮৬	—	—
	হিন্দু	৬৭২১৪২০	৭৫.২৩	২২.৩১
	মুসলমান	২১৬৮০৫৮	২৪.২২	২২.৯৭
১২.	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৬৯০৬৬৮৯	—	—
	হিন্দু	৪৫৪৮৪৫৯	৬৫.৮৬	১৫.১৪
	মুসলমান	২২৯৫৯৬৭	৩৩.২৪	৩৪.১৭
১৩.	হুগলী	৫০৪১৯৭৬	—	—
	হিন্দু	৪২১৬৭০১	৮৩.৬৩	১০.১৬
	মুসলমান	৭৬৭৪৭১	৭.৫১	২৮.৮৭
১৪.	বাঁকুড়া	৩১৯২৬৯৫	—	—
	হিন্দু	২৬৯৩০২২	৮৪.৩৫	১০.১৬
	মুসলমান	২৩৯৭২২	৭.৫১	২৮.৮৭
১৫.	পুরুলিয়া	২৫৩৬৫১৬	—	—
	হিন্দু	২১১৬০৩৭	৮৩.৪২	৪.৫৯
	মুসলমান	১৮০৬৯৪	৭.১২	৩৫.৭৪
১৬.	মেদিনীপুর অবিভক্ত	৯৬১০৭৮৮	—	—
	হিন্দু	৮২২৪৭৭৯	৮৫.৫৮	১৩.৭২
	মুসলমান	১০৮৮৬১৮	১১.৩৩	২১.১৬
১৭.	হাওড়া	৪২৭৩০৯৯	—	—
	হিন্দু	৩২০৪০৭৭	৭৪.৯৮	১০.৯১
	মুসলমান	১০৪৪৩৮৩	২৪.৪৪	২৬.০২

১৮.	কলকাতা	৪৫৭২৮৭৬	—	—
	হিন্দু	৩৫৫২২৭৪	৭৭.৬৮	০.১৬
	মুসলমান	৯২৬৭৬৯	২০.২৭	১৮.৯০

কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়

১৯৯১তে কলকাতার হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৫৪৬৪৩১

২০০১তে কলকাতার হিন্দু জনসংখ্যা হল ৩৫৫২২৭৪

অর্থাৎ সাকুল্যে ১০ বছরে কলকাতায় হিন্দু জনসংখ্যা বাড়ল ৫৮৪৩

১৯৯১ সালে কলকাতায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৭৭৯৪৩৩

২০০১ সালে কলকাতায় মুসলিম জনসংখ্যা হল ৯২৬৭৬৯

অর্থাৎ ১০ বছরে কলকাতায় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৬।

টি. ভি. রাজেশ্বর রাও, পঃ বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল স্টেটসম্যান কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শিরোনাম ছিল সিরিয়াস ইনফলাক্স ফ্রম বাংলাদেশ কাস্টমস (৬ এবং ৮ এপ্রিল ১৯৯০) সেই প্রবন্ধে শ্রী রাও উল্লেখ করেছিলেন কীভাবে সারা ভারতবর্ষের কোণে কোণে বাংলাদেশিরা ঢুকে গেছে। এমন কী অরুণাচল প্রদেশেও। তার মতে আসাম, ত্রিপুরা, পঃ বঙ্গ ও বিহারে বাংলাদেশি আগমন মারাত্মক। তিনি জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। পঃ বঙ্গ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন যে পঃ বঙ্গের অবস্থা ভয়াবহ। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে পঃ বঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ২১.৫১ শতাংশ এখন সেটা অনেক বেড়ে গেছে যেমন বীরভূমি ৩১ শতাংশ তো মুশিলদাবাদ ৫৮.৬৬ শতাংশ। তিনি আরও বলেছেন অনুপ্রবেশের ঠিক সংখ্যা বলা অসম্ভব। তবে রাজ্য পুলিশ ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী যে সংখ্যা দিয়েছে (আগে উল্লেখ করেছি - লেখক) তা মোট অনুপ্রবেশকারীর মাত্র ২০ শতাংশ।

ঐ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৯২ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের থেকে অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে যাবে। ঐ লেখায় বামপন্থী বুদ্ধিজীবী তথা বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ তথা সেন্টার ফর সাউথ এশিয়া স্টাডিজ-এর পরামর্শ দাতা শান্তিময় রায়-এর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। শান্তিময় রায় এর ধারণায় অন্তত একশত লক্ষ বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে যার ফলে এদেশের সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে। শ্রী রায় বলেছেন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দুদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, ধর্মস্থানে ভাঙ্গচুর ওখানকার হিন্দুদের পালিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। শ্রী রায় আরও বলেছেন যে ১৯৯১ সালের জনগণনা বাংলাদেশে যে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে তা কিন্তু বেশী হওয়া উচিত ছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বলা হয়েছে ১০ কোটি ১৪ লক্ষ। কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল ১১ কোটি ২ লক্ষ থেকে ১১ কোটি ১৪ লক্ষের মধ্যে। রাষ্ট্র সংঘের

কথা অনুযায়ী বাংলাদেশের লোকসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১১ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ১১ কোটি ১৮ লক্ষ। বাংলাদেশে লোক কমে যাওয়ার কারণ হল বাংলাদেশীরা ভারতে চলে এসেছে অনুপ্রবেশ করে। ১৯৯২ সালের ১৩ এপ্রিল স্টেটসমান পত্রিকায় শুধু নদীয়া জেলা সম্পর্কেই যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তা ভয়াবহ। বলা হয়েছে অবিরত অনুপ্রবেশের ফলে নদীয়া জেলার জনসংখ্যা ১৯৫১ থেকে ১৯৯১-৪০ বছরে বহুগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৫১তে ছিল ৪ লক্ষ, ১৯৯১ তে হয়েছে ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার। জনবসতির ঘনত্ব ছিল ১৭৮ বর্গ কিমি.তে ১৯৯১ তে হয়েছে ৯৮০-এর কারণও অনুপ্রবেশ বলে ঐ রিপোর্ট উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে এই অনুপ্রবেশের ফলে ঐ জেলায় সমাজ বিরোধী কাজকর্ম স্মাগলিং, চাল, ধান, চিনি, লবণ, ডিজেল, কেরোসিন এবং গরুর ব্যাপক চোরা চালান হচ্ছে। হাসপাতালেও বাংলাদেশীরা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

১৯৯১ সাল ১৩ ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যানে রিপোর্ট বেরোলো যে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবী করছে। তারা কলকাতার প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করেছে। তাদের সংগঠনের নাম বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ। প্রেস কনফারেন্সে তারা নিজেরাই ঘোষণা করেছে যে এদেশের আসার পাশপোর্ট বা ভিসা তাদের নাই। ঐ সংঘ দাবী করেছে তাদের সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৯২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রিপোর্ট বেরিয়ে ছিল যে বাংলাদেশ থেকে আসা বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীরা স্বাধীন মুসলিম বঙ্গভূমি দাবী করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৭১ থেকে অবিরত বে-আইনি অনুপ্রবেশের ফলে প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার এই ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বৈঠক করবেন। সভায় অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানের আলোচনা হবে।

এখানে অবশ্যই পাঠককে স্মরণে রাখতে হবে যে কাগজে যখন এই সব রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই. এম. নেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার।

এবার একটু তদানীন্তন রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথায় আসি।১৯৯১ সালের ৪ জানুয়ারী। কলকাতায় তিনি জেলা সমাহর্তাদের সভা করেছিলেন। সেই সময় তার প্রধান বক্তব্য ছিল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। সমস্ত জেলা শাসককে তিনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন - কী ব্যবস্থা নিতে হবে তাও বলেন। ৯টি সীমান্তবর্তী জেলায় রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা বিডিওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জেলা শাসকদের দিলেন। বললেন যে অনুপ্রবেশকারীরা রেশন কার্ড পেয়ে যাচ্ছে ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে ফেলেছে, আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগে দখল নিচ্ছে। এক কথায় বিজেপি এত দিন অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখাচ্ছিল বুদ্ধদেববাবুর

কথা শুনে মনে হল তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আনন্দবাজার কাগজে ৫ জানুয়ারী রিপোর্ট করল ঃ ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যা বাড়ছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন ধরে বলে এলেও এই প্রথম রাজ্য সরকার তা স্বীকার করে নিল। রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই এখন ব্যবস্থা নিতেই হবে। মুম্বাই থেকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে মহারাষ্ট্র যখন বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছিল তখন বুদ্ধদেবাবুরাই সোরগোল তুলেছিলেন। দেরীতে হলেও এখন টনক নড়েছে বুদ্ধদেববাবুদের অনুপ্রবেশ নিয়ে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন বুদ্ধদেববাবু।

সেখানেই জেলার কর্তারা তাকে জানান অনুপ্রবেশ সমস্যাই সব নষ্টের গোড়া। ওই বৈঠকের পর পুলিশমন্ত্রী বলেন শুধু অনুপ্রবেশ নয় বিদেশী উগ্রপন্থীরাও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে রাজ্য সরকার। পুলিশমন্ত্রীর মতে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলের একটা প্রধান অংশ অনুপ্রবেশকারীতে ভরা। আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে মুম্বাই ও দিল্লীর তুলনায় কলকাতা মরুদ্যান বলে গত ১ জানুয়ারী মন্তব্য করেছিলেন পুলিশমন্ত্রী। ঐদিন বৈঠকের পর তিনি জানতে পেরেছেন কলকাতা শহর আর মরুদ্যান নয়। সেখানে বিদেশী উগ্রপন্থীরাও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অনুপ্রবেশকারী ও বিদেশী উগ্রপন্থীরা রাজ্যে সক্রিয় হওয়ায় পুলিশমন্ত্রী এখন যারপর নাই বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন। তিনি বন্ধু প্রতিবেশী বাংলাদেশের গরীব লোকজনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজেদের দেশে ফেরৎ পাঠাতে চান। (আনন্দবাজার - ০৫.০১.১৯৯১)

রাজ্যের ২২০৩ কিমি. সীমান্তে এ পর্য্যন্ত ৫০৭ কিমি. কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ৯০০ কিমি. অংশে শীঘ্রই কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ৪৫০টি গ্রাম পড়েছে সীমান্তে। কীভাবে ঐ সব গ্রামের লোকেদের কাঁটাতারের বেড়ার এপারে আনা যায় সেই ব্যাপারেও বৈঠক আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় লোকেদের পরিচয়পত্র দেওয়ার ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব নিয়ে কম হইচই করেনি বামফ্রন্ট সরকার। ঐদিনের বৈঠকে সেই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা কিছুটা স্বীকার করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এইবার জ্যোতিবাবুর কীর্তির কথা বলি। রিপোর্টটা বেরিয়ে ছিল স্টেটসম্যান কাগজে ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর। বামফ্রন্ট ভোটার তালিকা নির্দেশ অমান্য করতে চাইছে। [Left Front plans to ignore poll panel directives].

বিদেশীদের সনাক্ত করে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য নিবালচন কমিশনের যে নির্দেশ মুখ্য নির্বাচনী অফিসারদের কাছে এসেছে তা অমান্য করার জন্য বামফ্রন্ট নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব মনীশ গুপ্ত সমস্ত জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের যারা জেলা নির্বাচনী অফিসার ও সহকারী নির্বাচনী অফিসার তাদের জানিয়েছেন যে রাজ্য তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিদেশী সনাক্তকরণ ও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার যে কাজ চলছে তা এখন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রথম রাজ্য যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনানুসারে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নির্দেশ যখন আসে তখন রাজ্যের ১৭টি জেলায় এক লক্ষ ভোটারকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করনের কাজ করে ফেলেছেন জেলা নির্বাচনী অফিসার ও সহকারী নির্বাচনী অফিসাররা। পুলিশ কর্তৃপক্ষ সেই সব এলাকার ফটোও তুলে নিয়েছেন যে সব জায়গায় বাংলাদেশীরা অধিক সংখ্যায় বসবাস করেছিল। মনীশ গুপ্ত এই বিদেশী সনাক্তকরণের কাজকে অতিরিক্ত উৎসাহ overzealous act বলে বুদ্ধদেববাবুর গভীর অসন্তোষের Strong displeasure কথা সংশ্লিষ্ট অফিসারদের জানালেন। ২৪ পরগণার ভোটার তালিকায় ৪০ হাজার জনকে বাংলাদেশী বলে সনাক্ত করা হয়েছে বলে সি. পি. এম. -এর জেলা নেতারা বুদ্ধদেববাবুর কাছে অভিযোগ করেন।

টালিগঞ্জ, আলিপুর, বড়বাজার, তালতলা, বিদ্যাসাগার, বালিগঞ্জ, মানিকতলা, বেলগাছিয়া (পূর্ব), কাশিপুর, শ্যামপুকুর এবং হাওড়ার ডোমজুড় সহ ২৪টি নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটার তালিকার কাজ নতুন করে করার নির্দেশ দিলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার লীনা চক্রবর্তীকে।

নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ শুনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দিল্লী থেকে কলকাতা বিমান বন্দরে বললেন মিঃ সেসন একজন মেগালোম্যানিয়াক। তিনি একটি পাগল।

কংগ্রেসের নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণার নেতারা নির্বাচনী অফিসারদের প্রাণের হুমকি দিলেন, বিদেশীদের নাম বাদ দেওয়া চলবে না এই তাদের দাবী। তখনকার অফিসারদের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের তখনই ৬০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী বাস করছে।

জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা পশ্চিমবঙ্গের থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন চান না কেন ? আমি আগেই উল্লেখ করেছি এই রাজ্যের ২৯৪টি বিনসভা আসনে অন্ততঃ ৬৪ টি আসনে অনুপ্রশেকারীরাই নিয়ন্তা। এই ৬৪টি আসন সীমান্ত এলাকায়। এছাড়াও কলকাতা এবং হাওড়ায় ব্যাপক অনুপ্রবেশ আছে। লক্ষ্য করবার বিষয় হল ঐ আসনগুলিতে বরাবরই সিপিএম জিতে আসছে। আর সীমান্ত জেলার কয়েকটি কংগ্রেসও জিতেছে।

১৫-১২-৯৮ তারিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক স্বীকার করেছে ভারতে অনুপ্রবেশকারী সংখ্যা মোটামুটি ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং তার মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ। উত্তরবঙ্গের জেলা কর্তৃপক্ষগুলি অনুপ্রবেশ সমস্যা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে খাচ্ছে, থাকছে, নিজের দেশে মালপত্র চালান করছে, আমাদের লোকেদের অসংগঠিত শিল্পের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে।

তারা রেশন কার্ড করে নিয়ে রেশন ব্যবস্থায় ভাগ বসাচ্ছে এবং চাপ সহ্য করতে না পেরে রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের নাম লাখে লাখে ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের প্রতিনিধিদের আমাদের বিধানসভা ও লোকসভায় পাঠাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশীদের সনাক্ত করে তাদের নিজেদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে না কেন ?

স্টেটসম্যান কাগজে এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর। ঐ রিপোর্টে খুব পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করলে কিছু রাজনৈতিক দলের, বিশেষ করে মার্কসবাদীদের নির্বাচনী সমর্থনে আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২.৪৫) ভারতবর্ষের গড় বৃদ্ধির (২.৩৫) থেকে বেশী। এর মধ্যে আবার সীমান্ত জেলাগুলিকে এই বৃদ্ধির হার রাজ্যের অন্যান্য জেলার থেকে বেশী। অথচ খোদ বাংলাদেশের জনসংখ্যায় বৃদ্ধির হার মাত্র ২.০২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে বৃদ্ধির হার যখন ৩.১৬ শতাংশ বাংলাদেশের সীমান্ত জেলায় বৃদ্ধির হার সেক্ষেত্রে মাত্র ১.৯৭ শতাংশ। আরও লক্ষ্যণীয় যে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন এলাকায় আবার জনবৃদ্ধির হার অত্যধিক। যেমন বারাসাত ৫.৪ শতাংশ, খড়দহ ৯.৫ শতাংশ, গোবরডাঙ্গা ৮.৬৪ শতাংশ, রায়গঞ্জ ১৩.৯৩ শতাংশ, ইংলিশবাজার ৮.৯৩ শতাংশ, তুফানগঞ্জ ২২.৪ শতাংশ।

দুই বাংলাদেশী সাংবাদিক বাংলাদেশের এক সাপ্তাহিক কাগজে (ঢাকা কুরিয়ার সেপ্টেম্বর ৬.১২.১৯৯২) লিখেছেন যে দিল্লিতে প্রচুর বাংলাদেশি আছে তাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার হতে পারে। অন্ততঃ চার পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলিম বোম্বাইতে ঢুকেছে। জয়পুর, আজমীর, আমেদাবাদ, বরোদায় এই বাংলাদেশীরা বহু সংখ্যায় ঢুকে পড়েছে। যদিও তারা খুব খারাপ অবস্থায় থাকে তবু তারা স্বীকার করেছে যে, নিজেদের দেশে তারা যে অবস্থায় থাকত তার থেকে ভাল অবস্থায় ভারতবর্ষে আছে। [The Weekend observer, Oct. 3, 1992, The unending Refugee Influx].

বিখ্যাত লেখক বালজিৎ রাই তার ডেমোগ্রাফিক ইনভ্যাসন এগেনস্ট ইন্ডিয়া [Demographic Invasion against India - Baljit Rai. B. R. Publishers, Chandigarh, P-166] বইতে লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন। পশ্চিমবঙ্গ তাদের কাছে যেন বাংলাদেশের বর্দ্ধিত এলাকা। সভ্যজগতের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই তারা পাচ্ছে কোন বাড়তি মূল্য না দিয়ে। এ রাজ্যে তাদের জন্য সমস্ত দরজাই খোলা - তারা জমি কিনতে পারে, বসত বাড়ী বানাতে পারে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে পারে, রেশন কার্ড পেতে পারে, ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারে এবং তা সত্ত্বেও ইসলামী জীবন

যাত্রা পালন করতে পারে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার এতই আশীর্বাদ। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রাজ বাংলাদেশের রক্ষিতার মত। বাংলাদেশ এখানে ক্ষমতা ব্যবহার করছে অথচ কোন দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। বলজিৎরাই এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি ভ্রমণ করে এবং এদেশী বাংলাদেশীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে যা উপলব্ধি করেছেন তা ঐ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন -

১। সমগ্র ২২০৩ কিমি. ব্যাপী সীমান্তে বাংলাদেশ ৫ থেকে ১০ কিমি. বিস্তৃত মুসলিম প্রধান এলাকা তৈরি করেছে।

২। প্রতি দশকে, সীমান্তে জেলাগুলিতে জন্মহার বৃদ্ধির হার উচ্চতম।

৩। পূর্ণবয়স্ক (adult) মানুষের সংখ্যা এত বেশী যে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ব্যতীত তা সম্ভব নয়।

৪। অনুপ্রবেশ সি পি এম এবং কংগ্রেস দলের সাহায্য পুষ্ট।

৫। দুশ টাকার বিনিময়ে যে কোন অনুপ্রবেশকারী রেশন কার্ড পাচ্ছে। কংগ্রেস ও সি পি এম উভয়ই ওদের রেশন কার্ড পাইয়ে দিচ্ছে নিজ নিজ ভোট ব্যাংক বাড়ানোর জন্য।

৬। জাল সার্টিফিকেট-এর ভিত্তিতে মুসলিম ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। ধরা পড়ার পরেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

৭। বাংলাদেশী মুসলিমরা স্বদেশে নিজেদের সম্পত্তি বিলি-বিক্রী করে দিয়ে এদেশে এসে চাষের জমি কিনছে। স্থানীয় মুসলমিরা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদে এ কাজে সহযোগিতা করছে।

৮। তাদের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে ঐ অনুপ্রবেশকারী মুসমিলরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

৯। এক শ্রেণির দাদাল তৈরি হয়েছে যারা কম দামে চাষের মজুর ও ব্যবসার জন্য মেয়ে সরবরাহ করে। ঐ চাষের মজুরদের উড়িষ্যা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১০। অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তের এক জায়গায় তাড়িয়ে দিলে অন্য জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়ে।

১১। সীমান্তে উপযুক্ত রক্ষী বাহিনী নাই যারা আছে তারা সংখ্যায় এতই নগণ্য যে অনুপ্রবেশকারী ও তাদের সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল ও সম ধর্মাবলম্বীদের কাছে তারা সর্বদাই হীন হয়ে থাকে।

১২। প্রচুর অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে তার মধ্যে গরু চুরি প্রধান।

১৩। স্মাগলিং জীবন ধারণের উপায় হিসাবে গৃহীত।

শ্রী বলজিৎ রাই তার ডেমোগ্রাফিক ইনভ্যাসন এগেনস্ট ইন্ডিয়া [Demographic

Invasion against India - Baljit Rai. B. R. Publishers, Chandigarh, P-166] পুস্তকে কয়েকটি খবরের কাগজের রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন। ওই সব রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন ওই সব রিপোর্টগুলির সারাংশ হল ঃ

১। সি পি এম - কংগ্রেস ও জনতা দল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তকরণ ও বিতাড়নের যে আইন আছে তা কার্যকরী হতে দিচ্ছে না কারণ ওদের ওই দলগুলি নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক রূপে ব্যবহার করছে।

২। কংগ্রেসের এইচ কে এল ভগত এবং রাজেশ খান্নার নাম অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছেন।

৩। রাজ্যওয়ারী অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশের ১৯৯২ সাল পর্যন্ত

ক)	পশ্চিমবঙ্গ - ৪০ লক্ষ	খ)	আসাম - ৪০ লক্ষ
গ)	বিহার - ২০ লক্ষ	ঘ)	দিল্লি - ৩ লক্ষ
ঙ)	মধ্যপ্রদেশ - ৩ লক্ষ	চ)	মুম্বাই - ১লক্ষ ৫০ হাজার
ছ)	উত্তরপ্রদেশ - ৫০ হাজার	জ)	রাজস্থান - ১০ হাজার

(১৯৯২-১৯৯৭) এই পাঁচ বছরে অনুপ্রবেশ বহুগুণ হয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশী। ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করার সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীরা উৎসাহ পেয়েছে এবং যারা এক সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন তারাই এখন বলেছেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে অনুপ্রবেশের সংখ্যা।

৪) যে সব জায়গায় অনুপ্রবেশকারীরা অনেক বেশী সংখ্যায় ও সংগঠিতভাবে আছে—

ক) মুম্বাই - ট্রম্বে, খেরওয়াড়ি, বারহামপদা, একজন অনুপ্রবেশকারী ইন্টারভিউর সময় বলেছে - ভারতে ঢুকে পড়ে বসবাস করা খুবই সহজ, এখানে যে কোন সুবিধাই পাওয়া যায় এমন কী রেশন কার্ডও এখানে করতে পারেন। আমি যে একজন বাংলাদেশী।

খ) বিহার, দীর্ঘলব্যাংক, আমেদাবাদ, কুরাশাকাঠপাটা, কিষণগঞ্জ, পুর্ণিয়া, কাটিহার, সাহেবগঞ্জ।

গ) উত্তরপ্রদেশ, বারাণসী, কানপুর, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, হরিদ্বার

ঘ) দিল্লী, সঞ্জয় অমর কলোনী, যমুনাপোস্তা, সীলামপুর, সীমাপুর, নিজামুদ্দিন, কালকাজি এবং জাফরাবাদ।

ঙ) আসাম - গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি দরং, নওগাঁ, কামরুপ, মরিগাঁ, বড়পেটা, নলবাড়ি।

৫) বাংলাদেশে কোন বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠালে তারা ফেরৎ নেয় না, যতক্ষণ কোন প্রমাণ পায় যে তারা বাংলাদেশের মানুষ।

৬) পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশেরই বর্দ্ধিত এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে বাংলাদেশীরা মুসলিম বঙ্গভূমি দাবী তুলেছে।

৭) রাজনীতিকরা উটপাখির মত চোখ বন্ধ রেখে সমস্যা এড়াতে চাইছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণে মুসলিমরা এদেশে চলে আসে আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় অত্যাচার। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় ১৯৯৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী একটি ছোট খবর প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার বিচারপতি কিম্বাউড রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের মনোনীত ছিলেন – এ্যাটর্নি জেনারেল পদের জন্য। কিন্তু কিম্বাউড তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন এই কারণ দেখিয়ে তার বাড়ির আয়াটি (বেবি সীটার) যে চার বছর তার বাড়িতে আছে সে একজন বাংলাদেশী বলে তিনি জানতে পেরেছেন। দেশের আইন লংঘন করে বিদেশীকে আশ্রয় দিয়ে তিনি যে অন্যায় করেছেন সেই কারণে তিনি ঐ ধরনের অতি সম্মানিত পদ থেকে নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন।

এ দেশের কংগ্রেস, সি পি এম ও জনতা দল কী একথা কখনও অনুধাবন করবেন যে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার লিস্টে না ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের ভোটে জয়ী হয়ে তারা যে লোকসভা ও বিধানসভায় যাচ্ছেন তাদের সেই নির্বাচন অবৈধ ?

প্রসঙ্গ ক্রমে একটা খবর দিই ১৯৬০ এর দশকে নেদারল্যান্ড এর প্রোটেস্টট্যান্টরা সন্দেহ করতে শুরু করেছিল যে জন্মহার বৃদ্ধি করে ক্যাথ্লিকরা নেদারল্যান্ডে সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। তারা নিজেদের (প্রোটেস্ট্যান্টরা) নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলত। কিন্তু বছর তিরিশ পরে ঐ সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছিল। নেদারল্যান্ডে এখন এককালের সংখ্যাগুরু প্রোটেস্ট্যান্ট এখন সংখ্যালঘু এবং এককালের সংখালঘু ক্যাথলিকরা এখন সংখ্যাগুরু। [The Demographic Seige - Keonrad Elst voice of India, New Delhi P-46]

এদেশেও এরকম সম্ভাবনা আছে যে কেবলমাত্র অনুপ্রবেশ ও জন্মহার বৃদ্ধির সাহায্যে হিন্দুস্থানকে একসময় পাকিস্তান করে ফেলা হবে। কিন্তু তা ঘটতে হয়ত তিনশত বছর সময় লাগবে। কিন্তু অতিরিক্ত ধর্মনিরপেক্ষরা যদি একথার গুরুত্ব নাও দেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র অনুপ্রবেশের ফলে দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, আইন শৃঙ্খলা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটি বিচার করবেন তো। ১৯৯২ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে জনৈক পুনম কৌশিক দি ট্রিবিউন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ৭ বছর পরে ১৯৯৯ সালে দেশে অনুপ্রবেশ কী অবস্থায় আসতে পারে সে কথা লিখেছিলেন। আজ ২০১৪তে আমরা দেখছি পুনম কৌশিকের আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে। পঃ বঙ্গের সীমান্তের নয়টি জেলা অনুপ্রবেশের ফলে তাদের ভারতীয় পরিচয় হারাতে বসেছে, মুসলিম বঙ্গভূমির দাবী উঠেছে। আসাম অনুপ্রবেশ সমস্যা সর্বাধিক প্রপীড়িত এবং ত্রিপুরা ও আসাম ও পঃ বঙ্গের মত নাভিশ্বাস অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যে পঃ বঙ্গ রাজ্য সরকার ৭ বছর আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করে অনুপ্রবেশে প্রশ্রয় দিয়ে ভোট ব্যাংক তৈরী করেছিলেন দলের জন্য সেই রাজ্য সরকারও এখন বলছেন সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে (আনন্দ বাজার পত্রিকা ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৯ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সম্পর্কে রিপোর্ট)।

আরও একটি দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল পঃ বঙ্গের বড়ো খবর কাগজগুলি অনুপ্রবেশ সমস্যাটির ভয়ংকরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা এ চান না। অথচ লক্ষ্য করবেন পঃ বঙ্গের মন্ত্রীসভার অনেক সদস্যের মতো এই সব সংবাদপত্রের অনেকেই অধুনা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত বঙ্গ সন্তান। এদের অনেকের হয়তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু এদের বাবা-কাকা-জ্যাঠা-মামারা তখরকার পূর্ববঙ্গে যে কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন সে কাহিনী নিশ্চয় এরা শুনছেন আর জনসংখ্যা অকারণে বৃদ্ধি ঘটলে একটা দেশের জাতীয়তা ক্ষতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক রাজনীতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপন্নতাও যে কতখানি হয় তা না বোঝার মতো নির্বোধ এরা নন। তবুও এরা উদাসীন কেন ? এ সম্পর্কে কিছু লিখলে বা বললে সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায় না - ধর্ম নিরপেক্ষতার ভাঁড়ারে টান পড়ে ? নাকি এদের ব্যক্তি স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের থেকে বড়ো ? পরবর্তী জেনারেশনের কাছে এদের কী কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু নাই ?

রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার লোভে বিপদটা প্রশ্রয় দেবেন আর সাংবাদিক, সংবাদপত্র তাবৎ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নপুংসকের মতো বিপদটি সম্পর্কে অনুত্তেজিত থেকে তাকে প্রশ্রয় দেবেন - এ কেমন জাতীয়তাবাদ এ কেমন ধর্ম নিরপেক্ষতা ?

সংবাদের স্বার্থেই বলি পৃথিবীর বিখ্যাত ঐশ্লামিক দেশগুলিও নিজের দেশে অন্য দেশের মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় তো দেয়ই না বরং বিতাড়ন করে। রাজীব শুক্লা ১২-২-৯৫ তারিখে সানডে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (The Unwanted guestes) । তিনি লিখেছিলেন যে, পাকিস্তান একজনও বাংলাদেশিকে নিজের দেশে থাকতে দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে শত শত বাংলাদেশিকে পাকিস্তান গুলি করে হত্যা করেছে। মালয়েশিয়ার প্রায় ১ লক্ষ বে-আইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ছিল। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মালয়েশিয়া সরকার তাদের সবাইকে বহিষ্কার করেছে। সৌদি আরব, ইউনাইটেড আরব এমিরিটাস এবং কাতার ঐশ্লামিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও ৫০ হাজার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়ন করেছে। এমনকি বাংলাদেশের থেকে শ্রমিক নেওয়ার চুক্তি করেও মালয়েশিয়া সরকার তা একতরফাভাবে বাতিল করে দিয়েছে যখন ঐ চুক্তির সুযোগে চুক্তি উল্লিখিত সংখ্যার থেকে বেশি বাংলাদেশীরা আসল। (The Demographic Seige, Keonrad Elst. P-20)

এই নিবন্ধের প্রথম দিকে আমি বলেছি মুসলমিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জন্মহার বৃদ্ধির কথা। এখন একটি বিষয় ধ্যান দেওয়া দরকার যে বাংলাদেশের থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণেই চলে আসছেন অথবা ঐ কারণের সঙ্গে অন্য কোনও উদ্দেশ্যও আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবারের ক্ষেত্রেও যেমন দেশের ক্ষেত্রেও তেমন দারিদ্র্যের কারণ। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানে না।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৯৬ ইয়ারুকে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৫ বছর

ও তার নীচে তরুণের সংখ্যা ভারতে ৩৫.২ কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যথাক্রমে ৪৬.৩ ও ৪৫.১ (Encyclopedia Brittanica 1996 Yearbook)

প্রফেসর জুডিখ ব্রাউন ১৯৯৫ সালের অক্টোবরের অনুষ্ঠিত Annual South Asia এ বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ২৫ বা তার কম বয়সের জনসংখ্যা ব্রিটেনে ৩৩ ভারতের হিন্দুদের মধ্যে ৪৮ কিন্তু পাকিসানে ৬০ আর বাংলাদেশে ৬৩।

এই বয়সের এই সংখ্যাকে জনসংখ্যার অনুপাত এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করে যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অর্থনীতির প্রাথমিক তত্ত্ব মানে না। তাই তারা যখন এদেশে অনুপ্রবেশ করে তখন সেই অনুপ্রবেশকারীরাও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানতে চায় না। এদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মুসলমানরাও সাধারণভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নন। আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর যে বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে বা ব্লক ভিত্তিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শিবির করে, সেখানেও দেখা গেছে শতকরা ১ জন মুসলিম মহিলা বা পুরুষ অপারেশনের জন্য আসেন না। মুসলিমদের জন্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন মহম্মদ সমীউল্লাহ। তিনি বলেছেন রসুন মহম্মদের যুগে যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ নামক সরকারি রক্ষস মাথা তুলত তাহলে রসুল অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, ঐ রাক্ষুসে ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও করতেন। [Muslims in Alien Society - Delhi p-90, chap-8]

আবার সঈদ নকভী বলেছেন যে ইসলামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

মহম্মদ সমীউল্লাহ তার ঐ পুস্তকে ৯৭ পৃষ্ঠায় আবার বলেছেন যে কোরান অনুযায়ী শিশুরা জীবনের অলংকার। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার নিয়ন্ত্রণ শরিয়তের বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। তিনি আরও বলেছেন যে শুধু ধর্মীয় কারণে নয় স্বাস্থ্যের কারণেও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভালো নয়। ঐ ব্যবস্থায় শরীরের ক্ষতি হয়। সামাকি কারণে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এতে পশ্চিম দেশগুলির মতো অনৈতিক যৌনাচার বাড়ে। যোগীন্দর সীকন্দর নামে এক প্রাবন্ধিক একটি প্রবন্দে লিখেছেন মোল্লাহদের প্রচারে সাধারণ মুসলমানদের মনে ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ পরস্পর বিরোধী। [Bogey of Family planning and Islam in Observer of Budiness and Politics 27.2.93]

ত্রয়োদশ শতকের ইসলাম ধর্মীয় নেতা ইবনে তাইমিয়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে বলেছিলেন। তার যুক্তি ছিল যে আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছা যদি জন্ম হওয়া হয় তবে কোনও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই তাকে আটকাতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই খাটে না।

ঠিক একই সুরে কথা বলতে শোনা যায় ওয়াসী আহমেদ সিদ্দীকি কে। তিনি বলেছেন ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুমেদিত কারণ ক্রীতদাসীরা গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করলে সে মুক্ত হয়ে যায়। তাই যাতে সে গর্ভতী হতে না পারে তাই

তার ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত। [Wasi Ahmed Siddiqi - Family planning and Prophet. Letter published in India Express. 30.4.90]

ইবনে জাকেরিয়া আজ-রাজী একজন চিকিৎসক ১৭৬ রকমের জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন বলে শোনা যায়। আবার আবু আলি ইবনে সিনা কয়েকজন জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন বলে একটি পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে। [Quoted in Lucas Catherine ; Islam Voor Ongelovegen. EPO Antwerp 1997 p-215 as referred to by Keonrad Elst in his Demographic Seige]

বদরের যুদ্ধের পর নবী অজ্‌ল্ (আরবি শব্দ, ল্যাটিন) রূপ জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করেছিলেন। তবে শমীউল্লাহর মতে পরবর্তীকালের হাদিসে তিনি নাকি এ ব্যবস্থাও নাকোচ করেছিলেন। তবে যে মহিলারা অসুস্থ গর্ভ ধারণের ও প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না তাদের ক্ষেত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত হয়েছে ইসলাম।

মধ্যযুগের মুসলিম চিকিৎসকরা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণের এত রকম ব্যবস্থা করে থাকেন, স্বয়ং নবী যদি বদরের যুদ্ধের পর অজ্‌ল্ রূপ জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বলে থাকেন তাহলে আধুনিক মুসলিমরা ও তাদের সংগঠন এবং ধর্ম প্রচারকরা (তবলীগ) তাদের পুরোহিতরা (মোল্লাহ মৌলানা) তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি (মক্তব মাদ্রাসা) জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে কেন। এর একটাই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই যে সে সময়ে ইসলামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত বলে বলা হয়েছে যে যুগে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃইদ্ধর হার ক্ষতিগ্রস্ত হত না। দ্বিতীয়তঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণকে ব্যক্তি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমোদন করা হলেও (যা এখন অনেক মুসলমান করে থাকেন) এটিকে একটি গণ ব্যবস্থা বা পাবলিক পলিসি হিসাবে নেওয়া হয়নি। কিন্তু এ যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ গণ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করার প্রশ্ন এসেছে। তৃতীয়ত তখনকার দিনে ধর্মান্তর করণের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা যত দ্রুত বাড়ানো সম্ভব ছিল এখন আর ঐ পদ্ধতিতে এত জনসংখ্যা বাড়ানো অসম্ভব হয়ে গেছে। তখনকার দিনে মুসলিম প্রাধান্য ছিল অবিসংবাদিত কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মহম্মদ শমীউল্লাহর মতে দেশের রাজনৈতিক সম্মান ও মিলিটারী শক্তি তার জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ইসলামে জনসংক্যার একটা বিশেষ মূল্য আছে। জিহাদকে কার্যকরীভাবে চালাতে গেলে জনসংখ্যা প্রয়োজন। [Muslim in Alien Society - M. Samiullah p-95-96]

মনে হয় স্বধর্মীদের বিস্তার সম্পর্কে প্রাচীন ইচ্ছা ও মহিলাদের মাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখার ইচ্ছা এই দুই কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ মুসলিমরা মানতে রাজী নয়।

তাহলে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে এই যে মুসলিমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করবেই অর্থাৎ পরিবার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে গণ ব্যবস্থা হিসাবে তারা গ্রহণ করবে না। এদেশে যারা ভারতীয় মুসলমান আছে তারাও নয়। ওদেশে থেকে যারা অনুপ্রবেশকারী আসছে তারাও নয়। এর পিছনে

ধর্মীয় সমর্থন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ফলে যে কোনো দেশেই সংখ্যালঘু হয়ে প্রবেশ করে বা থাকতে থাকতে কয়েক শতাব্দী পরে (ভারতের ক্ষেত্রে যেমন ৩৬৫ বছর বলে রফিক জ্যাকেরিয়া হিসাব করেছেন) সেই দেশকে ঐশ্লামিক দেশে রূপান্তরিত করে দেওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক ঐশ্লামিক দেশই ধর্মান্তর করণকে প্রধান সহায় করেছিল কেবলমাত্র জন্মসংখ্যা বাড়িয়ে সব দেশ ঐশ্লামিক হয়নি। তফাৎটা এই যে কেবলমাত্র জন্মহার বৃদ্ধি করে কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় ধর্মান্তর ও অনুপ্রবেশের সাহায্যে তার থেকে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয়। আর যদি কোনো দেশের জন্য জনগোষ্ঠী ঐশ্লামিক করণে ঐ ব্যবস্থায় অর্থাৎ ধর্মান্তরকরণে, জন্মহার বৃদ্ধিতে অনুপ্রবেশে, বাধা দেয় তবে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই সব দেশের মেকী ধর্ম নিরপেক্ষরা নিশ্চয় একে সাম্প্রদায়িকতা বলবেন। আপনার যদি ধর্ম প্রচারের অধিকার থাকে তবে আমারও ধর্ম বাঁচানোর অধিকার আছে। অপর সমস্যাটি সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম নিরপেক্ষ সমস্যা। অর্থাৎ এত সংখ্যক অনুপ্রবেশ এবং এত উচ্চ জন্মহার দ্রুত ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এই অনুপ্রবেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, দেশকে বিপন্ন করে তুলছে। বিপন্ন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমাজবিরোধী কাজকর্ম চোরা চালান, মাদক ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাচার কী না হচ্ছে। এক কথায় দেশের নিরাপত্তা আজ বিপদের সম্মুখীন।

তাই কাজ আমাদের দুটি। এবং দুটিই ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপলব্ধ। অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করে নিজের দেশে ফেরৎ পাঠাতেই হবে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত ভারতীয়কেই আনতে হবে। দ্বিতীয় কাজটি সময় সাপেক্ষ কারণ এটি রাতারাতি করার কাজ নয়। ভারতীয় সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এনিয়ে প্রচার আবশ্যক। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এমন মুসলিম দেশগুলির উদাহরণ তুলে ধরতে হবে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে দল মত সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই নির্দয় এবং যুক্তিবাদী হতে হবে। হ্যাঁ এমন কী ভারতীয় মুসলিমদেরও অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে সম্প্রদায় ভিত্তিক বিচারে না গিয়ে আর্থিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচার ধারায় দেখতে হবে। ইতিপূর্বেই বেশ কয়েকটি দেশে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এমন কি ঐশ্লামিক দেশ ও তার নিজের দেশে মুসলমান অনুপ্রবেশ দৃঢ়ভাবে দমন করেছে জাতীয় স্বার্থে। আমাদেরও জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রী সেখ হাসিনা ওয়াজেদ তিন দিনের সফলে এসেছিলেন (২৭-২৯ জানুয়ারী) এদেশে। পঃ বঙ্গেব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে। জ্যোতি বসু বললেন যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সেখ হাসিনা বললেন যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে না। এর আগেও বাংলাদেশ একই কথা বলেছিল যে সে দেশ থেকে এদেশে কোনও অনুপ্রবেশ হয়নি। তারা সেবারে স্পষ্টত প্রমাণ চেয়েছিল। এবারও দেশের

প্রধানমন্ত্রী সরাসরি প্রমাণ যদি চান নি তবু ভাবটা এই রকম ছিল যে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনতে গেলে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে আনতে হবে। কিন্তু জ্যোতি বসু প্রমাণ পেশ করতে পারলেন না কারণ এ রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্তকরণের কাজ করাই হয়নি। বস্তুত ১৯৯৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর আগে অনুপ্রবেশের বিষয়টা স্বীকারও করেনি রাজ্য সরকার। চাপটা অনুভাব করছিল কিন্তু কে দিচ্ছে সেটা প্রকাশ্যে বলতে রাজি হয়নি রাজ্য সরকার। তাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রমাণ চাইতে পারেন যেহেতু তিনি জানেন যে রাজ্য সরকারের কাছ প্রমাণ নেই।

ওরা (সি পি এম) চলে যাওয়ার পর যাঁরা (তৃণমূল কংগ্রেস) এলেন তারাও অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে বিশেষ সহানুভূতি পোষণ করেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীতো সি পি এম-এর থেকে বেশী ইসলামী।

আসলে সিপিএম, তৃণমূল ভোটার মুসলমানকে যতটা চেনেন, কোরানীয় মুসলমানকে ততটা চেনেন না। তাই তারা মুসলমানকে তার ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক করে দেখেন। বিশেষ করে, এরা যখন বলেন যে, কোন ধর্মই সন্ত্রাস করতে বলে না, তখনই বোঝা যায় এরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কতটা মূর্খ না হোক, কতটা অজ্ঞ। এরা জেনেও জানেন না যে এরা বর্তমান ক্ষমতার লোভে এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বন্ধক দিয়ে দিচ্ছেন। এই বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতা হয়ত আছে যেহেতু এরা সরকারে আছেন কিন্তু এই বন্ধক দেওয়ার নৈতিক অধিকার এদের নাই।

দেশের মধ্যে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই এই সিপিএম এবং তৃণমূল রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। যারা এই সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলে, তাদের 'সাম্প্রদায়িক' বলে গাল পাড়ে। সন্ত্রাসকারীরা যেহেতু সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান তাই তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সি পি এম এবং তৃণমূলের গায়ে ফোস্কা পড়ে। ঘরে আগুন লাগে। সাম্প্রতিক বর্ধমান কান্ডে (২ অক্টোবর, ২০১৪) তো ক্রমশঃ বোঝাই যাচ্ছে সরকার পক্ষের পুলিশ এবং সরকারপক্ষীয় দল সন্ত্রাসকারীদের সঙ্গে কতটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তারা সত্যটাকেও সামনে আসতে দিতে চায় না। এরা কেন অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন? অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাস বন্ধ হলে এরা ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আরও একটি কথা বলেছেন যে তাদের দেশের শ্রমশক্তিকে তিনি বিভিন্ন দেশে শ্রম বিক্রি করতে পাঠান — এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না। ব্যাপারটা শ্রমিক রপ্তানি। মালপত্র রপ্তানি করা হয় সেগুলি ফিরে আসে না। কিন্তু রপ্তানিকরা শ্রমিকরা কী বাংলাদেশে ফিরে আসে ? এই প্রবন্ধে লিখেছি যে বাংলাদেশে শ্রমিক ও ব্যবসার জন্য নারী রপ্তানি করার কাজ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এবং উদাহরণও দিয়েছি যে অন্যান্য ঐশ্লামিক দেশ কীভাবে রপ্তানি করা বাংলাদেশি শ্রমিকদের অনুপ্রবেশকারী রূপে সনাক্ত করে ফেরত পাঠিয়েছে এমনকি শ্রমিক আমদানি ও রপ্তানি করার চুক্তিও কেতরফাভাবে বাতিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ করা দরকার যে তারা কোন্ দেশে কত শ্রমিককে শ্রম বিক্রি করার জন্য পাঠিয়েছে তার কোনো আইন গ্রাহ্য রেজিস্টার বা নথী রাখেন কী ? যদি এরকম রেজিস্টার বাংলাদেশ রেখে থাকে তবে তারা বলুক আইন সঙ্গতভাবে কতজন বাংলাদেশিকে তারা এদেশে শ্রম বিক্রির জন্য পাঠিয়েছেন এবং যদি এমন পাঠিয়ে থাকেন তবে সময় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে কিনা।

১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে যে ৫৮৮৪৯১ বাংলাদেশি নাগরিক বৈধ কাগজপত্র নিয়ে এদেশে এসেছিলেন তারা কি বলতে পারবেন যে তারা বাংলাদেশি নয় ? আর তারা বৈধভাবে এসে এদেশে অবৈধভাবে থেকে গেল কেন ? অবশ্য বৈধ ভাবে এসে অবৈধভাবে থেকে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদেরই দেশে সরকারেরই দেখার কথা। কিন্তু কেবলমাত্র ভোটের লোভে তা করা হয়নি।

আসামের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া একবার বলেই ফেলেছিলেন যে আসামে ২০-৩০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী আছে। পরে কোনো এক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি তার বিবৃতি প্রত্যাহার করেছিলেন।

১৯৯৯-র জানুয়ারী মাসের শেষ দিনে অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম তারিখে পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেইছিলেন যে বর্তমান যে অবস্থা তাতে অনুপ্রবেশকারী সনাক্ত করে ফেরৎ পাঠান এক দুরূহ ব্যাপার। ঠিক এই সময়ই সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন দেশে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত হতে পারে।

একটি বিষয় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের সময় ছয়জন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল (Inter-Ministerial Committee) কীভাবে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো যায় সে বিষয় পথ নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। সময়টা ছিল ১৯৯২ সাল। সেই সময়কার খবর কাগজগুলিতে যে সব রিপোর্ট বেরিয়েছিল তাতে বলা হয়েচিল যে এদেশে প্রায় এক কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে এবং তারা প্রধানত ঝুপ্পী ঝুপড়িতে বসবাস করে এবং তাদের নাম ভোটার লিস্টে ঢুকে গেছে। আরও জানা গেছিল যে অনুপ্রবেশকারীদের অনেকেই সমাজ বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত (The Statesman March '8, 1992) কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের দলীয় ভোট ব্যাংক এর সঙ্গে যুক্ত করে ফেলায় কেউই গুরুত্বর সঙ্গে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করেনি। পঃ বঙ্গে সিপিএম এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য (পঃ বঙ্গে অংশত) কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তকরণ বা বিতাড়নে উৎসাহী ছিল না। তার ফলে যে ছয় সদস্যের কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৯২তে সে কমিটি অপরেশন পুশ ব্যাক কার্যক্রম ফলপ্রসু করতে পারল না। অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে বিতাড়ন করার কাজটিকে অপারেশন পুশব্যাক নাম দিয়ে চালু করা হয়েছিল।

কিন্তু অপারেশন পুশব্যাক যুদ্ধে কোনো জেনারেল ছিল না – গোটা ব্যাপারটাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ সৈন্যদের হাতে। অর্থাৎ সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশদের

(বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সংক্ষেপে বি. এস. এফ.) হাতে। বি. এস. এফ-এর দায়িত্ব ছিল ঐ অনুপ্রবেশকারীদের সীমানা পার করে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়ার।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম। সীমাপুরী থানার পুলিশ ১৩২ জন বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করে তুলে দিয়েছিল বি.এস.এফ-এর হাতে। বি.এস.এফ অনুপ্রবেশকারী দলের মাথা ন্যাড়া করে ভীড়াক্রান্ত রেলগাড়িতে চড়িয়ে দিলেন।

আর যায় কোথায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল বামপন্থীদের, মানবিক অধিকার রক্ষা কমিটির, কংগ্রেস ও সমতা দলের। কি এত বড়ো অমানবিকতা এত বড়ো অসম্মান? হলই বা অনুপ্রবেশকারী তারা মানুষ তো। তাদের মাথা নেড়া করে দেওয়া হবে ? তাদের ঐরকম ভিড় ঠাসাঠাসি ট্রেনে তুলে দেওয়া হবে ? এদের সঙ্গে যোগ দিল কিছু সংবাদপত্র ও তাদের টাকা খাওয়া কিছু সাংবাদিক। আরম্ভ হল দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব অনুপ্রবেশকারীদের মানবিক অধিকার ও আত্মসম্মান রক্ষার সংগ্রামে সামিল হল বামপন্থীরা, মানবিক অধিকার রক্ষা কমিটি, এ্যামনেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল, মুসলিম সংগঠন সমূহ, বাংলাদেশ সরকার, কংগ্রেস ও জনতা দলের মধ্যকার সেই সব স্বদেশ প্রেমী অনুপ্রবেশ বিতাড়নে যাদের ভোট ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কলকাতা ও দিল্লীর হাইকোর্টে দুটি রিট মামলা দায়ের করা হল। বাদী পক্ষে থাকল যাদের অনুপ্রবেশকারী বলে সনাক্ত করে বিতাড়ন করা হচ্ছিল। বিবাদী সরকার ও প্রশাসনিক কর্তারা। কলকাতা হাইকোর্ট বাদী পক্ষের মামলা লড়লেন স্বনামখ্যাত বামপন্থী আইনজীবী অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জী। বাদী পক্ষের নাম অবশ্য ঘটা করে দেওয়া হল – এ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস। বিচারপতি – উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী। বাদী পক্ষের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশীদের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছিল এবং এটা অমানবিক ব্যবহার। মামলার রিপোর্ট বেরিয়েছিল দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২১.১১.১৯৯২। দিল্লী হাইকোর্টে মামলার বাদী পক্ষে ছিল গ্রামীন সেবা সমিতি (সম্ভবত কোন মুসলিম সংগঠন)। অভিযোগ ছিল এই অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের নামে পুলিশ লুঠ করেছে বাড়ী পুড়িয়েছে। এ ছাড়াও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা অমানবিক আচরণ করছে। বিশেষ কথা বলা হয়েছিল এই যে – যাদের বাংলাদেশী বলে পুলিশ বিতাড়ন করতে আসছে তারা ভারতীয় তাদের রেশন কার্ড আছে এবং ভোটার তালিকায় তাদের নামও আছে।

অপারেশন পুশ ব্যাক সম্পর্কে এমন হৈ চৈ ফেলা হল – সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাংবাদিক সহ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল এমন ঝড় তুলল যে – বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা নয় স্বয়ং সরকারই অপরাধী হয়ে গেল। (দি স্টেটসম্যান কাগজে ৭.১০.৯২তে রিপোর্ট ছিল)

টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার অমূল্য গাঙ্গুলি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস্ কাগজের হিরণ্ময় কালেকার, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া কাগজের বি. জি. ভার্গিস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর চঞ্চল সরকার এম. জে. আকবর প্রভৃতি কয়েকজন সাংবাদিকের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করতেই হয়। এছাড়া আর কিছু সাংবাদিক ছিলেন এবং এখনও আছেন যারা এই সমস্যার ভিতরে কখনও প্রবেশ করেননি সমস্যার গুরুত্ব বোঝেন না - তাদের লেখা পড়লে বুঝা যায় এ বাবদে তারা কতটা মূর্খ। তবু তারা লেখেন কারণ তারা পয়সা পান হয়ত তাদের অর্ডার দিয়েই লেখানো হয়।

সমস্যাটি না বুঝে অজ্ঞের মত কথা বলার ব্যাপারে আমাদের একদা এক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থনে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন এইচ ডি দেবেগৌড়া (হারদোনহাল্লি দেদ্দেগৌড়া দেবেগৌড়া) আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তার প্রথম উক্তি ছিল যে এই রকম যে, বাংলাদেশের লোকেরা তো পশ্চিমবঙ্গে আসবেই একসময় তো এটা একটি দেশই ছিল একে অনুপ্রবেশ বলা যায় না। এ-যাতায়াত চিরকালের।

তা এই চিরকালের যাতায়াত যদি ছিল তাহলে জ্যোতি বাবুরা যে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে কেন বাধ্য হলেন, আর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি বসু যে কেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে অলংকৃত হলেন না, তা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেন নি। একটি দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যদি অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধের মতো কথা বলেন সেখানে অমূল্য গাঙ্গুলি বা চঞ্চল সরকার এ. জে. আকবরদের দোষ দিয়ে কী হবে ?

শ্রী বলজিৎ রাই তার বিখ্যাত পুস্তক ডেমোগ্রাফিক সীজ এগেনস্ট ইন্ডিয়াতে (Demographic Seige against India Baljit Rai,m B.S. Publishers, Chandigarh) অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পন্থার উল্লেখ করেছেন ঃ

১। পরিণতি যাই-ই হোক না কেন ভারত সরকারকে অনুপ্রবেশী বিতাড়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। ভারতের মুসলিমরাই দেশ বিভাগ চেয়েছিলেন অতএব বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের যে মুসলিমরা স্বদেশে থেকে গিয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাংলাদেশী ও পাকিস্তানীকে বিতাড়ন করতে হবে।

৩। একথা সকলকে সমঝে দিতে হবে আমরা এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা আর কাউকে যুক্ত করতে চাই না তাই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের এদেশে থাকা চলবে না।

৪। ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ না করে যারা বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ করবে তাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের হাতে উল্কি এঁকে দিতে হবে। অপারেশন পুশ

ব্যাক-এ যা করা হয়েছিল তার করার দরকার নেই।

৬। রাষ্ট্রসংঘ, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এবং দেশের সংবাদমাধ্যমগুলির সাহায্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে যে, বাংলাদেশ সরকার তাদের নিজের দেশের বিরাট জনসংখ্যা সমস্যা সামলাতে পারছে না এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে গভীর আর্থ সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে।

৭। বাংলাদেশকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করতে হবে।

৮। অনুপ্রবেশ বিতাড়নের ক্ষেত্রে ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজিসকে যুক্ত করতে হবে, তাদের নিজের দেশে ফেরৎ পাঠানোর আগে তাদের ক্যাম্প করে রাখতে হবে এবং যতদিন না তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করানো যায় ততদিন তাদের গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে।

৯। বিদেশীদের জন্য যে আইন আছে (The Foreigners Act) কঠোরভাবে বলবৎ করতে হবে।

১০। যে সব রাজনৈতিক দল ও নেতা ভোট ব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশ বিতাড়ন বিরোধিতা করবেন তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনতে হবে।

১১। যে সমস্ত মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের রেশনকার্ড দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বাতিল করতে হবে এবং ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাতিল করতে হবে।

১২। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কোন মামলা দেশের কোনও আদালতে শুনানী করা চলবে না।

বালজিৎ রাই বলেছেন যে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে গ্রহণ করেও যদি কাজ না হয় তাহলে আর দুটি ব্যবস্থা নেওয়া যায় -

১। বাংলাদেশী মুসলিমদের হিন্দু ধর্মে পুনঃপ্রবর্তন করানো - অধিকাংশ পুর্ব পুরুষ তো হিন্দু ছিলেন।

২। জনসংখ্যা বিনিময়-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের ভারতবর্ষে আনা এবং এদেশের মুসলিমদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পাঠানো। ১৯৪৭ সালে জন বিনিময় হয়েছিল। এখন পদ্ধতি গ্রহণে আপত্তি ওঠার কথা নয়।

কিন্তু হিন্দুত্বে পুনঃ ধর্মান্তরকরণ বা জন বিনিময় কোনটাই আমাদের মূল সমস্যা আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে পারবো না। আমাদের প্রয়োজন অনুপ্রবেশকারী সনাক্তকরণ ও তাদের বিতাড়ন। এই কাজের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এই সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার আর যারা অনুপ্রবেশের পক্ষে গান গাইবে সে সাংবাদিক বা রাজনৈতিক যেই-ই হোক তাকেও

সনাক্ত করা। আমাদের প্রচারে কয়েকটি কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে,

১। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ যার আয়তন মাত্র ১৪৪০০০ বর্গমাইল যদিও দেশটি পশ্চিমবঙ্গের থেকে বড় তবু তাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ছোট।

২। ঐ দেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী প্রায় ১২ কোটি। পরবর্তী ২৫ বছরে এই জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ৩২ কোটিতে দাঁড়াবে। তারা থাকবে কোথায় – খাবে কী ?

৩। বাংলাদেশে জনবসতির ঘনত্ব সর্বাধিক প্রতি এক বর্গকিমিতে ৭৭৬ জন।

৪। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ একটি এবং এদেশ ক্রমশ আরও দরিদ্র হচ্ছে।

৫। শিক্ষায় ঐ দেশ অনেক পিছিয়ে। নারীদের শিক্ষার হার লজ্জাজনক ভাবে কম।

৬। বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থা মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে ফলে সাম্প্রদায়িক কারণেই ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করা ওদেশের অঘোষিত নীতি।

এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার ঠিক এই মুহূর্তে অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে আমাদের রেশন কার্ড, ভোটার তালিকা, অসংগঠিত শ্রমিক, শিক্ষা প্রভৃতিতে দখলদারী নিয়েছে। কীভাবে শ্রমিক ও নারী পাচার চক্র গড়ে উঠেছে সমাজ বিরোধী কাজকর্ম সীমান্ত এলাকায় কতটা ভয়ংকর হয়েছে। এমনকি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করেই বর্তমানে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যথেষ্ট দেরী হয়েছে আর দেরী নয়।

হ্যাঁ, আমাদের ভয় আছে। জিন্নাহ্ সাহেবের এন্তেকাল হয়েছে কিন্তু ওরা তো বেঁচে আছেই। ওরা মানে কমিউনিস্টরা। যারা জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সম্প্রদায় ভিত্তিতে হিন্দুস্তান পাকিস্তান ভাগ করেছিল। যারা স্লোগান দিয়েছিল পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে। এখনতো আবার তৃণমূলীরাও।

তাই আমাদের ভয় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে। ওরা আবার সম্প্রদায় ভিত্তিতে দেশ ভাগ চাইবে। ওরা মানে মুসলিম লিগ, আই. এস. আই., সি.মি., আমাদের দেশের অনেকে। ওরা দেশ ভাগের যে পরিকল্পনা দিয়েছিল তাতে আমরা এই পঃ বঙ্গ পেতাম না।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর চেষ্টায় আমরা এই পঃ বঙ্গ পেয়েছি। যে পঃ বঙ্গের সংগে ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেও বেঁচে আছে। যে সব জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বেশি সেই সব জেলা ভারতবর্ষ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার দাবি তুলবে। এমনিতেই তো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার থেকে বেশি ভয় আবার দেশ বিভাগ।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সব ঐশ্লামিক দেশেই ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে অর্থনৈতিক

কারণে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিমরা ধর্মের দোহাই দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে না। এইজন্যেই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে ওরা পায়দা করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। জন্মহার বাড়িয়ে জনসংখ্যা বাড়িয়ে, অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে - এই দেশকে একটি ঐশ্লামিক দেশে পরিণত কর। যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আজ না হ'ক - কয়েক বছর পরেই ভারত ঐশ্লামিক দেশ হয়ে যেতে পারে।

পঃ বঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী। অনেকগুলি জেলাতেই জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। সেগুলিতে কমিউনিস্টরা আর মোল্লা মৌলভীরা সমস্বরে দাবী তুলবেন দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। আর সে প্রস্তাবে রাজি না হলে দেশ জুড়ে বাধবে দাঙ্গা - যেমন ভারত বিভাগের আগে হয়েছিল।

ঐশ্লামিক দেশে যেমন অ-মুসলমানরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক এবং লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত কারণ তারা আল্লাহ্-কোরাণ ও শেষ রসুলের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন্যস্ত করে না তেমনি কমিউনিস্ট দেশেও অ-কমিউনিস্টরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক কারণ তারা শ্রেণি সংগ্রাম ও সর্বহারার একনায়কত্ব বিশ্বাস করেন না। এই পঃ বঙ্গেও এখন তৃণমূল বিরোধীরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তারা প্রশাসনিক সাহায্য পায় না।

২০০১ সালের জনগণনার তথ্য পঃ বঙ্গের মানুষের কাছে আতঙ্কের। আতঙ্ক আবার দেশ ভাগের, আতঙ্ক আবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা দাঙ্গার। জিন্নাহ্ প্রয়াত হলেও তার দোসর গোষ্ঠী এখনও জীবিত। আর স্ট্যালিনিস্ট কমুনিস্টরা হিটলারের থেকেও মারাত্মক। বিরোধী মতবাদীদের গণহত্যা করা এদের কাছে জলভাত। তেমনি ধর্মের নামে হত্যালীলা ভারতবর্ষে এক হাজার বছর ধরে ঘটেছে। এখনও ঘটছে। তৃণমূলীরা কম যায় না।

তথাকথিত সেকুলারবাদী সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়ার উপর যতটা গুরুত্ব দেয়, ক্রিয়ার উপর দেয় না। ঠিক জানি না এদের পকেটে আরব ডলার পৌঁছায় কিনা তবে ওদের হিন্দু বিদ্বেষ ও মুসলমান প্রীতি খুব নগ্ন ভাবেই নজরে পড়ে। গোধরায় হিন্দু হত্যা এদের কাছে গুরুত্ব পায় না, কাশ্মীরে হিন্দু নিগ্রহ ও হিন্দুদের দলে দলে কাশ্মীর ত্যাগ ওদের নজরে পড়ে না - কিন্তু গুজরাটের দাঙ্গায় মুসলিম মৃত্যুতে ওদের চোখে জল ঝরে - যেন গুজরাতের দাঙ্গায় হিন্দু হত্যা হয় নি। গোধরায় মৃতদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু।

যদিও ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে প্রায় ১২ হাজার বার দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু দাঙ্গা ভারতে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে যখন ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম আক্রমণ হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন ইলিয়ট ও ডসন তাদের পুস্তক - দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স্ ওন হিস্টোরিয়ানস্-এ। কংগ্রেসী ও মার্কসবাদীরা একটি ভুল তত্ত্ব চালু করেছে যে - হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছে ইংরাজরা তাদের ডিভাইড এন্ড রুল কৌশলের মাধ্যমে। এই তত্ত্ব ভুল এই কারণে যে ইংরাজরা এদেশ শাসন করতে

আসার অনেক আগে থেকেই — বস্তুত ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই — হিন্দুদের লড়াই করতে হয়েছে মুসলিম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই অত্যাচারের কাহিনী মুসলিম ঐতিহাসিকরাই লিপিবদ্ধ করেছেন - আর তার উপর ভিত্তি করে ইলিয়ট ও ডসন তাদের বইটি রচনা করেছেন - দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স্‌ ওন হিস্টোরিয়ানস্‌।

২০০১ সালের জনগণনা ভারতের পক্ষে যতটা ভয়ংকর - পঃ বঙ্গের পক্ষে ততোধিক। শুধুমাত্র কলকাতায় ১০ বছরে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থা দেখলেই - আতঙ্ক আরও বেশি হয়। হিন্দু বেড়েছে ৫৮৪৩ আর মুসলিম বেড়েছে ১৪৭৩৩৬।

এই অবস্থায় আমাদের কাজ হল - অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, অনুপ্রবেশীদের বিতাড়ন করা, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তাদের যুক্ত করা। ভারতে ও পঃ বঙ্গে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন - দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তারাও এই আন্দোলনে সামিল হবেন। এটি কোনো দলের বিষয় নয় - কোনো সম্প্রদায়ের বিষয় নয় - এটি একটি জাতীয় বিষয় - যাতে সব দল ও সব সম্প্রদায়কে ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে।

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভোটের প্রচার করছিলেন, তখনই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন প্রসঙ্গে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করছে যে রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি, সেই দলের সভাপতি অমিত শাহ্‌ তার ভাষণে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

দেশ রক্ষার জন্য অনুপ্রবেশ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন - যদিও কোন সরকারই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি, বরং বলা যায় অবহেলা করেছে। আজ যদি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ সমস্যাটিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের দিকে অগ্রসর হন, কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতা, কিছু ইসলামী সংগঠন, কিছু সংবাদপত্র ও সাংবাদিক হৈ চৈ করবেন ঠিকই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পেলে দেশের সাধারণ মানুষ সমস্যা নিরসনে মোদী সরকারের সমর্থনে পথে নামবেন।

দাস প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন যদি গৃহযুদ্ধ করতে বাধ্য হন তাহলে অনুপ্রবেশ রুখতে গৃহযুদ্ধ নিশ্চয় খারাপ কিছু হবে না। গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও অনুপ্রবেশ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।